স্তুতি নয়, প্রস্তুতি ঃ সমালোচনায় যে-আদর্শ জরুরি

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

এক.

সূচনায় একটু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাচারণ করে নিই। গত বছরের ঘটনা, অঘটনও বলতে পারি। একজন কবির (পাঠকের তরফে পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ জানা বোধহয় আবশ্যক নয়) 'কবিতা-সমগ্র' হাতে আসার পর একটি পত্রিকায় অনুরুদ্ধ হই তাঁর একটি মূল্যায়ন-সমীক্ষা লেখার ব্যাপারে। নিবিড় পাঠের জন্য আমি সময় চেয়ে নিই বেশ খানিকটা। দুর্ভাগ্যত রচনাটি এর পরে প্রকাশযোগ্য হওয়ার আগেই রহস্যজনকভাবে প্রেরিত হয় ওই কবির কাছে। এবং তা মনোমত হয় না তাঁর। হয়না, কারণ আমার ঘনবদ্ধ হাতের লেখায় সাড়ে পাঁচ পাতার গ্রন্থপরিক্রমায় মাত্র ৫/৭ লাইনে কিছু বিরূপ মন্তব্য ছিলো। আপত্তিটা তাঁর এখানেই। তিনি হয়তো এমন প্রত্যাশাই করেছিলেন যে লেখাটি আদ্যোপান্ত তাঁর কবিকৃতির উচ্ছ্বাসময় প্রসংশায় ভরপুর হয়ে থাকবে, তার বদলে ওই ৫/৭ পঙ্ক্তির অন্যথারচরণ কেন, কেনই বা ওই সামান্য অসম্মতি? সবটাই তো অবারিত গুণকীর্তনে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, আর এটাই তো সম্ভবত আজকের দিনে অঘোষিতভাবে প্রত্যাশিত। সেখানে ওই মৃদু বিপক্ষতার স্থান কোথায়? তেমন দরকাই বা কী? সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ওই পত্রিকায় লেখাটি যাতে প্রকাশ না হয়, তার সুবন্দোবস্তও করে ফেলেন অন্তরালে।

কয়েকটি প্রশ্ন রাখি নিজের কাছেই; দীর্ঘদিন কবিতাচর্চা করে যিনি পাকাপোক্ত একটা আবস্থানে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন, ৫/৭ -টি লাইনকে তাঁর অত ভয় কেন? এতটা সন্ত্রস্ত হওয়ারই বা কী আছে? তাহলে পাকাপোক্ত, না কি বড়ই ঠুন্‌কো অপলকা তাঁর আসল অবস্থান? আস্থাবান হলে কখনোই আপত্তির কথা উঠত না, কিন্তু এতখানি আত্মশ্লাঘা, অস্তিতাবোধ কতটা মানায় একজন মাঝারি মানের কবিকে? কী তাঁর ভাবার কারণ যে আঙ্গিকের প্রশ্নে তাঁর কোনো দুর্বলতাকে, স্খলনকে আমি চিহ্নিত করে দেখিয়ে দেবো না? কেন তিনি ভাববেন না যে আলোচক হিসেবে তাঁর খামতিটা ধরিয়ে দেওয়াটাও আমার কৃত্য? অথচ এই তিনিই আবার ৫/৭ লাইনের বিরুদ্ধাচরণকে সহনীয় বলে ভাবতে পারছেন না মানে ভেতরে - ভেতরে ওই ক'টি ছত্রকে বোধহয় নিরুপায় হয়েই গুরুত্ব দিতে চাইছেন তিনি সবচেয়ে বেশি, দিতে হচ্ছে বাধ্যতায়। এটা কি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, নাকি আত্মবিশ্বাসের অভাব? সৌজন্যবোধের বিচারেও কেমন মনে হয় তাঁকে? নিরপেক্ষ সমালোচনায় এতটা উদ্বিগ্ন, এমনকি আশঙ্কিত হওয়ারই বা কী আছে? সমালোচনার সৌজন্যে একজন কবির পরম সহিষ্ণুতাই বা এত কম থাকবে কেন? কবিতা - সমগ্রের সূচনাবধি সমস্ত কবিতাই যে উচ্চামার্গের হয়ে থাকে, বুকে হাত দিয়ে কোন্ কবি বলতে পারেন সে-কথা? দু-একটি অপ্রিয় কথা বললেই যে সমীক্ষকের মন্তব্য অপ্রকাশযোগ্য করার দায়ভার নিয়ে নেবেন সেই কবি, এটাই বা কেমন, কতটা কাম্য তা? প্রত্যাশিতই বা কতখানি? অথচ এই অপ্রীতিকর ও অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার শরিক হতে হয় মাঝে - মাঝেই, সমালোচনার কাঙ্ক্ষিত আদর্শ সম্পর্কে দ্বিধা জন্মাতে থাকে একটু - একটু করে।

দুই.

আমাদের সৌভাগ্য, এই দ্বিধা কাটিয়ে দেওযার মতো লেখনীর ভারসাম্য অর্জন করতে পেরেছিলেন এক এবং অদ্বিতীয় বুদ্ধদেব বসু - পেরেছিলেন কারণ অন্যের যোগ্যতাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দনে স্বাগত জানাবার মতো ঔদার্য ও মানসতা একদিকে যেমন তাঁর ছিল, তেমন কখনো - কখনো বিরুপতাকে জ্ঞাপন করার সৎ সাহসও সঞ্চয় করতে দেখেছি তাঁকে। সমালোচক হিসেবে এই আদর্শটাই তো অন্বিষ্ট হওয়ার কথা তাঁর। একদিকে সত্যিকার কবিতার দরজা পৃষ্ঠপোষক, মুক্তমন অভিভাবক, অন্যদিকে অপ্রিয় সত্যভাষণেও অবিচল, সংকোচহীন, নির্দ্বিধ। অপ্রধান কবি-ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি যখন মুখ্য কাউকে কাউকে আলোচনার বিষয় করে তুলছেন, তখনও সমালোচনার এই রীতিকেই মান্যতা দিয়েছেন তিনি, নিরপেক্ষ মন্তব্যে স্থিত থাকতে চেয়েছেন আগাগোড়া, এবং একান্ত পক্ষপাতশূন্য লেখাও পড়েছি যার মধ্যে তিনি অকারণে নঙর্থক, কিংবা নেতিবাচর বক্তব্য নিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন, কারণ গঠনমূলক মূল্যায়নেই বিশ্বাস ছিল তাঁর, আস্থাবান ছিলেন 'creation within creation' এই প্রত্যয়ে। তাঁকেই মানায় 'কবি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে যখন তাঁকে বলতে শুনি'........ অনটনকে বড়ো দেখা শুধু অন্যায় নয়, অকৃতজ্ঞতা'।—

দৃষ্টান্ত ১. 'বাংলাকাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্ব - শক্তি নজরুল ইসলামের'। 'কালের পুতুল' -এর অন্তর্গত যে-লেখার দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর এই বিবৃতি, সেই পরিচ্ছেদেরই শেষাংশে তিনি বলেছেন, 'তাঁর প্রেমের গান সরস, কমনীয়, চিত্রবহুল; কিন্তু তার আবেদন আমাদের মনে যখনই ঘন হ'য়ে আসে, তখনই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কোন স্থূল স্পর্শে মোহ ভেঙে যায়। গীতরচয়িতার অন্য সমস্ত গুণ তাঁর ছিলো— শুধু যদি এই দোষ না থাকতো, শুধু যদি তাঁর রুচি নিখুঁত হ'তো তাহলে তাঁর মধ্যে একজন মহৎ গীতিকারকে আমরা বরণ করতে পারতাম। কিন্তু একটি দোষে অনেক গুণ ব্যর্থ হ'লো।

দৃষ্টান্ত ২. সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে ''সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান, যে-কোনো আদর্শেই না বিচার করি, মন দিয়ে পড়লে তাঁর কাব্যের সার্থকতা স্বীকার করতেই হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' আমার এ কথার সাক্ষ্য দেবে।'' লেখাটির সূচনায় এবং অবশিষ্ট অংশে অজস্র অভিনন্দন ছড়িয়ে দেওয়ার পরেও শেষ পর্বে তিনি কবিকে সতর্ক করা দিতেও ভুল করেননি। বলেছেন 'যদি তিনি বিশ্বাস

করেন যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর কর্তব্য, তিনি তা করবেন মানুষ ও কর্মী হিসেবেই, কবি হিসেবে নয়। কিন্তু যখন এবং যতক্ষণ তিনি কবি, কবিতার উৎকর্ষই হবে তাঁর সাধনা। হয় তাঁকে কর্মী হ'তে হবে, নয়তো কবি। তিনি কোন দিক ছাড়বেন?';

দৃষ্টান্ত ৩. অমিয় চক্রবর্তীর 'পালা - বদল' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যে-তিনি এমন বক্তব্য রেখেছিলেন— 'তিনি আর রবীন্দ্রনাথ একই জগতের আধিবাসী, যে-জগৎ অন্যান্য সমকালীন কবিদের পক্ষে অপ্রাপনীয়'— সেই তিনিই তাঁর অভিনব ও চিত্তহারী ভাষাব্যবহার সম্পর্কে দ্বিধাহীন হতে পারেন নি। সন্দিগ্ধচিত্তে এই তাঁর বিবৃতি : '"পারাপার' ও 'পালা- বদল'-এ দেখা যাচ্ছে তল্ প্রত্যেয়ের পৌনঃপুনিক ব্যবহার, ইন্ ভাগান্ত শব্দের প্রতি হয়তো বা একটু অহেতুক আকর্ষণ এবং বিশেষ্য থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ থেকে বিশেষণ রচনা করবার প্রণবতা।" দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সংসারতা', 'আপনতা', 'ধ্যানতা', 'আনন্তিক', 'যৌবনী জনতা', 'চন্দনী ধূপ' ইত্যাদি শব্দচরিত্রকে তিনি তেমনভাবে অনুমোদন করতে পারেন নি।

নিবিষ্ট সমালোচক হিসেবে খুব কি ভুল কথা বলেছিলেন বুদ্ধদেব? পাঠকের মনে রাখা দরকার, ওপরের ওই যে ত্রয়ী উদ্ধৃতি, তা আমি নির্বাচন করে এমন কিছু পেশ করছি এখানে যার সূত্রে উল্লিখিত তিনজন কবি সম্পর্কে তাঁর কিছু বিরুদ্ধ মত তিনি নিবেদন করছেন অগাধ আস্থা থেকে। কখনো সে-সব নিবেদনে ছিল অসমর্থন, সাবধানবাণী কিংবা আশংকাজাত সংশয়। এসব লেখার রচনাকাল ছিল যথাক্রমে ১৯৪৪, ১৯৪০ এবং ১৯৫৫। এর কোনো পর্যবেক্ষণই কিন্তু পরবর্তী সময়ে অবিবেচনাপ্রসূত ভ্রান্ত মন্তব্য বলে খারিজ করে দিতে পারিনি আমরা। এবং যা লক্ষণীয় তা তাঁর প্রত্যয়চর্চিত ভারসাম্য। পাঠকের কাছে শুধু এই অনুরোধ রাখি। যে-সব লেখা থেকে বাছাই করা অংশ এখানে সন্নিবেশিত হলো, সে-লেখাগুলোর সম্পূর্ণাঙ্গ পাঠে বুদ্ধদেবের পক্ষপাতশূন্য শিল্পিত ব্যালেন্সকে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন, দেখে নিন তাঁর প্রত্যক্ষণে গুণকথনের পাশে কীভাবে জড়িয়ে থাকে নির্মোহ প্রস্তুতি, গৌরবজ্ঞাপনের পাশাপাশি কী অনন্য ভারসাম্যতায় জানাতে পারেন তিনি অনুযোগ, আস্থার হাত ধরে কখন জেগে ওঠে সংগত সংশয়। শুধু অসমর্থনের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ এক তথ্য, তার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে বলি ওজনে ভারী সাধুবাদের কুরনিশ, তাঁর সুসমঞ্জস উপস্থাপনা, সুনিপুণ সংহত সমীক্ষা।

তিনি.

প্রবন্ধগদ্যে ওই সজাগ ভারসাম্যের প্রশ্নে, — অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নজরুল -এর পরে—আমরা তাকাতে পারি রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ সম্পর্কিত তাঁর আলোচনার নিরপেক্ষ পরিবেশনের দিকে, দেখে নিতে পারি প্রতিভা তর্পনের পাশাপাশি অমনোনয়নের সাহসী প্রবণতাও কীভাবে স্থান করে নিচ্ছে তাঁর সমালোচনাশিল্পে। সৎ আবেগী উচ্ছ্বাস ভাষা খুঁজে নিচ্ছে এইভাবে ঃ

ক. রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা ক্রমশই বিস্তৃত হ'য়ে, বিচিত্র হ'য়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে।

খ. তিনি মহামানব, আজকের পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, সমস্ত ইতিহাসে এমন আর ক'জন আছেন তাঁর সঙ্গে যাঁদের তুলনা হতে পারে।

গ. এত বেশি না লিখে এত বড়ো তিনি হতেন না, অসংখ্য বার না-বললে কোনো কথাই তাঁর বলা হ'তো না; তাঁর পরিমাণেই তাঁর মহত্ত্বের পরিমাপ।

বুদ্ধদেব ছিদ্রান্বেষী সমালোচক ছিলেন না। অকাবণে অভিযোগ দায়ের করার দায় ছিল না তাঁর লেখনীর। তবু এসব বিবৃতির বিষয়গৌরব রবীন্দ্রনাথ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু ব্যক্তিগত মতপোষণের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি, এমন কি কখনো - কখনো জানিয়েছেন তাঁর অমনোনয়ন, অনুযোগ, নালিশ। জানিয়েছেন এই ভাষায় : 'তিনি (রবীন্দ্রনাথ) আক্রান্ত হননি আধুনিক নাগরিক জীবনের কোন চরিত্রলক্ষণে।... আধুনিক বিক্ষুব্ধ নগর তাঁর মগ্ন চেতনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি' (কবি রবীন্দ্রনাথ), কিংবা কবি আর কথাশিল্পীর বিরোধে তাঁর উপন্যাসের ধর্ম যে অক্ষত থাকে নি, সে-অভিমত জানাতেও তিনি নিঃসংকোচ, নির্দ্বিধ ঃ 'দুয়ের বিরোধে ক্ষতি হয়েছে উপন্যাসের; কবিত্ব যখন দমিত হয়েছে তখন এসেছে 'নৌকাডুবির' কৃত্রিমতা, আর যখন প্রশ্রয় পেলো তখন দেখি 'ঘরে বাইরের' আতিশয্য, 'শেষের কবিতায়' বিষয়বস্তুতে যাথার্থ্যের অভাব।" কিছুটা পরেই নিজের প্রাক্তন অভিমতকে সামান্য বিন্যস্ত করে তুলছেন অন্যতর দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যরকম ব্যাখ্যায়, খাঁটি বিশ্লেষকের ভূমিকায় গুছিয়ে নিচ্ছেন নিজেরই অস্বিষ্ট, সদর্থক বক্তব্যের একটু যেন সংস্কারসাধন করে নিচ্ছেন পূর্বের মতকে : 'এই অবস্থায় কবিকে বাদ দিয়ে কথাশিল্পীর বিচার চলবে না; রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ বেছে নিতে হ'লে আমাদের খুঁজতে হবে কোথায় তাঁর দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে, একটা অন্যটাকে ছাপিয়ে ওঠেনি, কোথায় কবিত্বের দিকটা গল্পের সঙ্গে এমনভাবে মিলে-মিশে আছে যে কোনোটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয়া যায় না।' এই হলো একজন বিশুদ্ধ, সজাগ, দূরদর্শী আলোচকের ভারসাম্যযুক্ত মূল্যায়ন। নিজস্ব মতকেও ভিন্ন মতের সন্ধানী করে তুলেছেন, কখনো - কখনো পূর্বতন অভীষ্ট থেকে সরে এসে নিজেকে ভিন্ন লক্ষ্যে স্থাপন করতেও তাঁর জড়তা নেই এতটুকু। এতে যে রবীন্দ্রনাথের অবস্থানের সামান্যতম গৌরবহানি ঘটেছে তা নয়, কিন্তু সমালোচকের প্রত্যাশিত কৃত্য ও দায়বদ্ধতার ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে আমরা শিখতে পেরেছি অনেক, জেনে নিতে পেরেছি যে একপেশে গুণগান নয়, একতরফা প্রশস্তি নয়, চুলচেরা আপাতকঠোর এবং অখন্ড অবলোকনই আদর্শ সমালোচনার পরাকাষ্ঠা। নিছক স্তুতি নয়, মহত্ত্বের দিকে আরো একটু উশকে দেওয়ার জন্য, প্রাণিত করার জন্য, উদ্দীপিত করার জন্য আলোচকের তরফেও একটা প্রস্তুতির পর্ব জরুরি হয়ে ওঠে, তাঁকেও তৈরি থাকতে হয় মত-অমতের, পছন্দ-অপছন্দের দীর্ঘ পথ বেরিয়ে একটা সুস্থির মীমাংসায় পৌঁছনোর ব্যাপারে, আর সেই প্রদত্ত সমীক্ষার সৌজন্যে গোপনে - ভেতরে তৈরি হতে থাকে একজন

লেখকের যাবতীয় সামর্থ্য।

রবীন্দ্রনাথের পরে জীবনানন্দ, লালনে ও পরিচর্যায় বুদ্ধদেবের ভূমিকা প্রায় কিংবদন্তীপ্রতিম। যে - তিনি সূচনা থেকে জীবনানন্দের প্রচারক পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এমন মন্তব্য রাখতেও দ্বিধাগ্রস্ত হননি: 'জীবনানন্দ শুধু বর্ণনাধর্মী লিপিকার নন, অতি গভীর ভাবনাঋদ্ধ এক কবি, আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান,'' কিংবা মূল্যায়নে যিনি মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতে চান এই মহার্ঘ, ''আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মর্তব্য যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধি'র মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ,'' সেই বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ - বিরোধিতাও আমাদের কাছে স্মরণীয় ইতিহাস হয়ে আছে বই কি,—

> ''জীবনানন্দ দাশ কী লিখছেন আজকাল? আমাদের এই নির্জনতম স্বভাবের কবি, প্রকৃতির কবি তিনি, তা ছাড়া কিছুই নন, —হয়তো কেন, নিশ্চয়ই— কিন্তু পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিস্ট, কুখ্যাত আইভরি টাওয়ারের নির্লজ্জ অধিবাসী, সেই জন্য ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত করে তিনি এইটেই প্রমাণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন যে তিনি 'পেছিয়ে' পড়েন নি। করুণ দৃশ্য এবং শোচনীয়।... হুজুগের হুংকারে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন। মনের অবচেতনে তাঁর এই কথাই কাজ করেছে যে আমি যদি এখনও মাকড়শার জাল, ঘাস আর শিশিরের কথা লিখি, তবে আর কি তাঁর পাঠক জুটবে? তবু কবিতায় মাঝে - মাঝে রোম - বার্লিন দেখলে লোক এ কথা অন্তত ভাববে যে লোকটা নিতান্তই মরে যায় নি।''

এ কোন্ বুদ্ধদেব? যিনি লেখার পর লেখায় অকৃত্রিম মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিয়েছেন জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে, কবিতাঘরানা নিয়ে, যাঁর একেকটি লেখায় ক্রমান্বয়ে আবিষ্কৃত ও আলোকিত হয়েছেন নির্জনতম এই কবি, যাঁর উদার আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠ হতে পেরেছে তাঁর একেক পর্বের সম্পন্নতা, — এ কি সেই একই বুদ্ধদেব? কেন এই নির্মম, নিষ্করুণ কশাঘাত? সে কি এইজন্য যে জীবনানন্দের প্রত্যাশিত প্রৌঢ় পরিনাতির মধ্যে এই স্খলন তাঁর কাছে আদৌ সহনীয় ঠেকেনি? না কি তিনি যে পলায়নপ্রবণ নন, এ-সত্যের প্রতিষ্ঠায় তাঁর আপ্রাণ প্রয়াস তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে নি বলে? নাকি নিজেরই কতগুলো দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাস থেকে বুদ্ধদেবের পক্ষে বিচ্যুত হওয়াটা অসম্ভব ছিল, সেই কারণেই। কিন্তু কারণ যাই হোক — ব্যক্তিগত, ঐতিহাসিক অথবা অন্য কিছু — আমি দেখাতে চাইছি শুধু এইটুকুই যে তেমন হলে তিনি সমালোচনায় কৃপাহীন হতেও কুণ্ঠিত হতেন না, অথচ এই কঠিন্যটাই একেক সময় আমার কাছে অন্তত বিরাট শিক্ষনীয় আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। বলতে পারি, বৌদ্ধিক অগ্নিপরীক্ষায় মধ্যে দিয়ে জীবনানন্দ তাঁর দীক্ষিত পাঠকের কাছে সময়ান্তরে আরো জীবনানন্দ হয়ে উঠতে পেরেছেন। নয় কি?

চার

আমরা আলোচনায় এই প্রেক্ষিতে হিসেবের বাইরে রাখতে পারি না সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে - কেও। সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা'র মূল্যায়নে তাঁর কবিতার গদ্যধর্মকে একদিকে অকুণ্ঠ ঔদার্যে স্বাগত জানাচ্ছেন : 'এ-গদ্য গল্পে বা প্রবন্ধে ঠিক ব্যবহার্যই নয়; এ যেন বিশেষবাবে কবিতারই বাহন', অন্যদিকে রাশ টানছেন সংযমী পর্যবেক্ষণে— 'কয়েকটি কবিতা'র রচনাগুলো মোটামুটি একই ধরনের; শব্দ ও বাক্যাংশ, উপমা ও বিশেষণের পুনরুক্তি কিছু দূর পর্যন্ত অনিবার্য ব'লে মেনে নিয়েও বইখানার ছোটো আকারের পক্ষে কিছু বেশি ব'লে মনে হয়। তাছাড়া পরিবর্তন প্রয়োজন; কেন না পরিবর্তনের ভাঙাচোরার ফলেই নতুন গঠন সম্ভব হয়'

সুধীন্দ্রনাথের কবিতাচরিত্রকে সম্ভ্রমের সঙ্গে ঐকান্তিক অভিনন্দন জানাচ্ছেন এইভাবে —'তাঁর কবিতা সশ্রদ্ধ পঠন ও আলোচনার যোগ্য; তাঁর নির্মাণের কলাকৌশল, তাঁর পূর্ণমনস্ক গঠনকর্ম আমাদের এই অতি শিথিল অতি তরল রচনার দেশে সত্যিই মূল্যবান।' কিন্তু সুধীন্দ্রিয় কলাকৌশলের বিচারে তিনি যে বলেন যা তাঁর শক্তি, তাই তাঁর দুর্বলতা, একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত এই দুটি বিপ্রতীপ ধারণাকে একটা সময় আমাদের মান্য করতেই হয়। করতে হয়, কারণ এ-মন্তব্য তাঁর কোনো চমক - লাগানো মন্তব্য নয়, দায়সারা প্রত্যক্ষণ নয়, তাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করছেন নিবিড় পাঠের সুবাদে, সপ্রমাণ যুক্তিযুক্ততায়,

> 'আমি অনুভব করেছি যে তার কবিতার গম্ভীর ধ্বনিগৌরব সত্ত্বেও পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অভিভূত হওয়া যায় না, প্রতি পঙ্‌ক্তির অর্থগ্রহণের জন্য বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখতে হয়, কেননা শব্দগুলি পরিচিত হ'লেও তার ব্যঞ্জনা অপ্রচলিত। সম্পূর্ণ কবিতাটি মনের মধ্যে ধরা দিলে পুলক লাগে, কিন্তু ধরা দেবার দীর্ঘ পথটি পার হ'তে হ'তে তার রস কি একটু ঝরে যায়, একটু কি ক্লান্ত হয়ে পড়ে সুসজ্জিত বাক্যবাহিনী?'

এ- লেখা ১৯৪৫ -এর। আর সুধীন্দ্রনাথ প্রয়াত হ'ন ১৯৬০ সালে। তার মানে মরণোত্তর কোনো কবিকে নিয়ে এ- লেখা লেখেন নি বুদ্ধদেব, লিখলে বলা যেত সেখানে ঝুঁকি ছিল কম। কিন্তু এ-দৃষ্টান্তে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বোধ হয় দেখিয়ে দেয় যে সৎ আলোচনার জন্য সৎ সাহসটাও দরকার, দরকার অপ্রিয় বাচনের দিকেও একটু এগিয়ে যাওয়ার মতো আত্মবিশ্বাস, মাঝে-মাঝে।

বিষ্ণু দে-র চোরাবালি' আলোচনার নিরিখেও বুদ্ধদেব প্রশস্তির সঙ্গে মিশিয়েছেন বিরুপ সমালোচনার সুর। বিশেষভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো বিষ্ণু-দে-র তিন মাত্রার ছন্দের ওপর অনায়াস অধিকার ও কর্তৃত্ব, চমকপ্রদ চিত্রকল্পের নিপুণ প্রয়োগ, এবং কবিতায় শব্দজাত ধ্বনির ওপর স্বচ্ছন্দ প্রভুত্ব। কিন্তু 'চোরাবালি'র সুধীন্দ্রনাথকৃত ভূমিকার সংযোজন তিনি আদৌ সমর্থন করতে পারেন নি, —এ-পরিচয়পত্র তাঁর কাছে একান্ত বাহুল্য ও অকারণই মনে হয়েছে; এমনও মনে হয়েছে ওই 'দুর্গম' ভূমিকা হয়তো বিষ্ণু দে-র কবিতাকে পাঠকের কাছে উপভোগ্য করে তোলার বদলে আরো দুরতিক্রম্যই করে তুলতে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় ও প্রবল আপত্তি তিনি তোলেন কবির শব্দগত কাঠিন্যের বিরুদ্ধে শাব্দিক দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে :

''আর - একটা জিজ্ঞাস্য। 'ক্রতুকৃতম', 'অপাপবিদ্ধমস্নাবির', 'সোৎপ্রাসপাশ', (এমন আরো আছে), এই সব শব্দ ব্যবহার ক'রে সত্যি লাভটা কোথায়? হয়তো কথাগুলোর জমকালো আওয়াজই প্রীতিকর, কিন্তু শারীরিক আলস্য অভিধান দেখার বিঘ্ন, এবং সাধারণ অভিধানে হয়তো সব পাওয়াও যাবে না। আপনার কি মনে হয় না যে সৎ পাঠক এ-সব শব্দে প্রতিহত হবে?''

দোষদর্শন বুদ্ধদেবের সমালোচনার অন্বিষ্ট নয়, একই সঙ্গে দীক্ষিত পাঠক হিসেবে বলবার মতো যা তিনি যথার্থ বলে মনে করেন তা বলতে দ্বিধা করেন না, বরং কবিতার গভীর পাঠ নেওয়ার পর সাহস করে সেই কথাটা বলাটাই কৃত্য বলে বিবেচনা করেন। যুগপৎ এটাও লক্ষণীয়, ওপরে যে-সব রচনার উল্লেখ করেছি তার সিংহভাগই কবিতাকে সদর্থক অভিনন্দনে মান্য করার নজির, স্তুতিসূচক আপ্যায়নের দৃষ্টান্ত; নেতিবাচক যেটুকু কথা তাঁকে বলতে হয়েছে তা সামান্যই হয়তো, কিন্তু সেই বলাটাকেও তিনি অবধারিত করে তুলেছেন আদর্শ প্রাবন্ধিকসত্তার দৃষ্টিকোন থেকে। কারুর কবিতাগত বিচ্যুতি নিয়ে অকারণ শব্দ ব্যয় করেন নি, বড়ো করে দেখাতে চাননি কোনো কবির উচ্চারণজনিত স্খলনকে, কারণ সে-পদ্ধতিটা তাঁর কাছে অনৈতিক, গর্হিত, এমন কি কৃতঘ্নতারই নামান্তর। নিষ্ঠালালিত বিশ্বাস নিয়েই তিনি বারবার এগিয়ে গেছেন কবিতার দিকে, কিন্তু কখনো বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি অসতর্ক মুহূর্তেও। কবিতা কখন পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়, লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি সে-বার্তাটুকুই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন একেক সময়। আপোষ করেন নি কোনো স্তরের কোনো কবির সঙ্গেই, অব্যাহতি দেন নি কোনো মানের কোনো কবিতাকেই।

পাঁচ

'To Judge the poets is only the function of poets,'—আজকের নয়, কথাটি বেশ প্রাচীন বয়সী অথচ এই বিবৃতির মধ্যে যে ভাষ্য, তার তাৎপর্য সময় পেরিয়ে আজও বোধহয় একইরকম থেকে গেল কবিকে বিচার্য করে তুলতে পারেন একমাত্র একজন কবিই। একজন কবিই পারেন অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যায়, কবিতার অন্দরমহলে অনুপ্রবেশ করতে, তারপর তার বোধগম্যতা, মর্মগ্রহণ, হৃদয়ঙ্গম, নির্যাস নিষ্কাশন, দ্যোতনা আবিষ্কার, ও ভাষ্যরচনা। এতগুলো পর্বে কবিতাকে আত্মস্থ করতে গেলে যে নিছক পাঠক হলেই চলে না, তা বলাটাই অপ্রয়োজনীয়। এসবের সমাহারেই ঋদ্ধ হতে হয় একজন মেধাবী সমালোককে, তাঁর বৈদগ্ধ্য নিয়ে, মননশীলতা নিয়ে, তাঁর মনস্বিতা নিয়ে। বুদ্ধদেব আজীবন-আমৃত্যু কবিতাকে দেখেছেন শুধু সমালোচক হিসেবে নয়, কবির চোখ দিয়ে, যে - চোখে ধরা পড়েছে উচ্চারণের রৌদ্র ও মেঘ, আলো ও অন্ধকার, পর মুহূর্তেই যে আঁধার আলোর অধিক। পরের প্রসঙ্গ থাক, নিজেকেই কি রেহাই দিয়েছেন কখনো? তৃপ্ত হননি কোনো সময় নিজের কোনো রচনা নিয়ে, গ্রন্থস্থ হওয়ার পরেও সংশয় - অসন্তুষ্টি - আক্ষেপ মেটেনি কখনো; চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিকে পরিমার্জনা ও সংশোধনের বিষয় করে তুলেছেন অনবরত, চার-পাঁচ-ছ'বার দেখার পরেও তাঁর কাছে আস্থাভাজন হতে পারত না কোনো ছাপাখানা, যতিচিহ্নের প্রয়োগসংক্রান্ত তাঁর খুঁতখুঁতে স্বভাব প্রায় ইতিহাস হয়ে আছে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। 'দ্রৌপদীর শাড়ি' প্রকাশকালীন তাঁর ছোটো একটি বিবৃতি বড় উন্মোচক এই প্রসঙ্গে : 'নিজের লেখার পরিবর্তন ও পুনর্লিখন— তাই নিয়ে আমি অনেকটা সময় কাটিয়ে দিচ্ছি— নতুন কবিতা লেখার চাইতে সেটা আমার কম জরুরি বলে মনে হচ্ছে না' ১৯৫৪-য় লিখছেন অন্যত্র : 'আমি আরম্ভ করলাম খুব সতর্কভাবে, যেন পা টিপে - টিপে চলছি। রচনা করি মনে-মনে, অদলবদল করি মনে মনে— পাকাপোক্ত কয়েকটা লাইন মনের মধ্যে তৈরি না-হওয়া পর্যন্ত খাতার গায়ে আঁচড় কাটি না— কেননা আমার প্রতিজ্ঞা এই যে ক'রে হোক ঠেকিয়ে রাখবো', ইত্যাদি। অথচ এই নিরন্তর পরিমার্জনার হাত থেকে তাঁর কণামাত্র নিষ্কৃতিও ছিল না কোনোদিন। 'মরচে - পড়া পেরেকের গান', 'একদিন : চিরদিন' ও 'স্বাগতবিদায়', এই তিনটি বইয়ের কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল 'ভেবে - ভেবে, থেমে - থেমে, কাটাকুটির জঙ্গল পেরিয়ে'। অজস্ররকম পরিশ্রমী পরিশোধনের পথ বেয়েই কবিতাকে ভালোবেসেছেন, কবিতা নিয়ে দিগ্‌নির্ণয়ী প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন একটার পর একটা, আর ওই প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল বলেই কবিতার সামান্যতম চরিত্রচ্যুতি মেনে নিতে পারেন নি ভেতরে থেকে। এক মত থেকে মতের ভিন্নতায় এগিয়ে গেছেন, হয়তো কখনো বিরোধ থেকে স্ববিরোধিতায়, সাধুবাদে, কিন্তু সুসংহত ভারসাম্যের প্রশ্নে আজো তিনি আমাদের কাছে শিক্ষণীয়, অনুসরণযোগ্য, প্রবন্ধ ও সমীক্ষা সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা।

এ-লেখার প্রস্তাবনায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করেছিলাম। আর সেখানে ছিল না বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কিত কোনো উল্লেখ। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শেষাবধি বৌদ্ধিক অনুপ্রবেশ। কোথায় এই সূচনার তাৎপর্য, প্রত্যাশিত রইলো। বিচক্ষণ পাঠক অনুধাবন করে নিতে পারবেন। আপাতনজরে মনে হতে পারে বিষয়ছুট অসংগত এই অবতারণা, কিন্তু সত্যিই তাই কিনা সে বিচারের ভার অর্পিত রইলো আমার পাঠকের ওপরেই, যিনি বুঝে নিতে পারবেন প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব তাঁর নিরপেক্ষ পরিবেশনভঙ্গি কতটা সংক্রাম সঞ্চারিত করতে পেরেছেন আমাদের মধ্যে, তাঁর উত্তরকালের গদ্যসাহিত্যে।